গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ২২ সংখ্যা ১১ - ১৭ জানুয়ারি ২০১৯ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

কেরালা থেকে উত্তরাখণ্ড ঃ ধর্মঘটে সর্বত্র সক্রিয় এসইউসিআই(সি)-র ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা

বাঙ্গালোর, কর্ণাটক

বাগনান, পশ্চিমবঙ্গ

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের শ্রমিক মারা নীতির বিরুদ্ধে ৮-৯ জানুয়ারি ৪৮ ঘণ্টা ধর্মঘটে সামিল হলেন সারা দেশের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ। এ আই ইউ টি ইউ সি সহ ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিক ফেডারেশনগুলি একযোগে ডাক দিয়েছিল এই ধর্মঘটের। ডাক, ব্যাঙ্ক, বিমা, ইস্পাত, কয়লাখনি, চা-বাগান, পরিবহণ সহ অন্য সমস্ত সংগঠিত শিল্পে এই ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়ে সারা দেশে। চটশিল্পে এই ধর্মঘট সর্বাত্মক সফল হয়। প্রতিটি রাজ্যেই আশা, অঙ্গনওয়াড়ি, মিড-ডে মিল, মোটরভ্যান সহ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরাও এই ধর্মঘটে সর্বাত্মকভাবে যোগ দেন।

দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, বাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ, আহমেদাবাদ, পাটনা, জামসেদপুর, লক্ষ্ণৌ, ভোপাল, চণ্ডীগড়, কলকাতা, গুয়াহাটি, আগরতলা, কটক সহ দেশের প্রায় প্রতিটি ছোট-বড় শহরে মিছিল, রাস্তা অবরোধ, রেল রোকো, পিকেটিংয়ে সামিল হন শ্রমজীবী মানুষ। জনগণের অন্যান্য শোষিত

পাঁচের পাতায় দেখুন

ক্ষতি আটকাতে প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল ফেরাতে হবে

প্রভাস ঘোষ

পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার সরকারি ঘোষণা সম্পর্কে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৪ জানুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলশিক্ষায় পাশ-ফেল প্রথা না থাকার ফলে কোটি কোটি শিক্ষার্থীর জীবনে অবর্ণনীয় ক্ষতি হয়েছে। ২০০৯ সালে এই সর্বনাশা নীতি চালু করার সময়েই আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই। শিক্ষক অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী মানুষের মধ্য থেকেও এই নীতির প্রতিবাদে বিক্ষোভের ঝড় ওঠে।

আমরা সর্বস্তরের শিক্ষানুরাগী মানুষকে যুক্ত করে গত দশ বছর সারা দেশ জুড়ে লাগাতার আন্দোলন চালিয়েছি। মানুষের এই ক্ষোভ-বিক্ষোভ ও আন্দোলনের চাপেই কেন্দ্রীয় সরকার আইন সংশোধন করে পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল ফিরিয়ে এনে শিক্ষার ক্ষতি আটকানো যাবে না। সর্বনাশা পরিণাম আটকাতে হলে প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনতে হবে।

এই দাবিতে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। যতদিন না সরকার এই দাবি মানছে, তত দিন আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।

‘কৃষকবন্ধু’ কীভাবে হলেন মুখ্যমন্ত্রী একটু ব্যাখ্যা করে বলুন

সুখে-শান্তিতে সপরিবারে বেঁচে থাকার জন্য নয়, মরলে চাষির পরিবারকে রাজ্য সরকার দেবে দু’লাখ টাকা।

ফসলের দাম না পেয়ে দেনার দায়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চাষিকে যদি বলা হয়, বেঁচে থাকলে তুমি কিছু পাবে না, মরলে পাবে ২ লাখ টাকা— একে সরকারি উদ্যোগে আত্মহত্যার প্ররোচনা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়! গরিব মানুষের প্রতি এ এক নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ। অথচ এই প্রকল্পের নাম ‘কৃষকবন্ধু’!

সংবাদমাধ্যমে ঢালাও বিজ্ঞাপন— কৃষকবন্ধু প্রকল্প নতুন বছরে মুখমন্ত্রীর উপহার। কিন্তু কৃষকরা কি সরকারের কাছে এমন উপহার চেয়েছে? কৃষকরা যা চায় তা হল সার বীজ কীটনাশকের দাম তাদের আয়ত্তের মধ্যে থাকুক। এগুলি নিয়ে ফাটকাবাজি বন্ধ হোক। সরকার কৃষিতে ব্যবহৃত বিদ্যুতের দাম, ডিজেলের দাম কমাক। তারা চায় ফড়ে-কালোবাজারি-মজুরদারের থাবা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ফসলের উপযুক্ত দাম। তাদের দাবি, সরকার উপযুক্ত পরিমাণ সহায়ক মূল্য ঘোষণা করুক এবং সে দাম যাতে প্রত্যেক কৃষক পায় সরকার তার ব্যবস্থা করুক। এগুলি হলে কৃষককে আত্মহত্যা করতে হয় না। সরকারকেও টাকা দিতে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। মুখ্যমন্ত্রী কি এই সমস্যাগুলির সমাধানের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন? সমাধান দূরের কথা, মূল এই সমস্যাগুলির কথা তিনি উচ্চারণও করেননি। সিপিএম সরকারের মতো তৃণমূল সরকারও কৃষি-বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েই চলেছে। কেন্দ্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তেলের উপর ট্যাক্স চাপিয়ে চলেছে— সেচের জন্য ব্যবহৃত পাম্পের তেলও তার থেকে রেহাই পায়নি। সরকার ঘোষিত সহায়ক মূল্য ফড়ে আড়তদার নামক নেপোতে খেয়ে যাচ্ছে, যা মুখ্যমন্ত্রী নিজেও স্বীকার করেছেন। সার বীজ কীটনাশক একচেটিয়া পুঁজির দখলে। সেগুলি নিয়ন্ত্রণের কোনও উদ্যোগ কেন্দ্রের মতো রাজ্য সরকারেরও নেই। এই সমস্যাগুলি এড়িয়ে কৃষকবন্ধু

দুয়ের পাতায় দেখুন

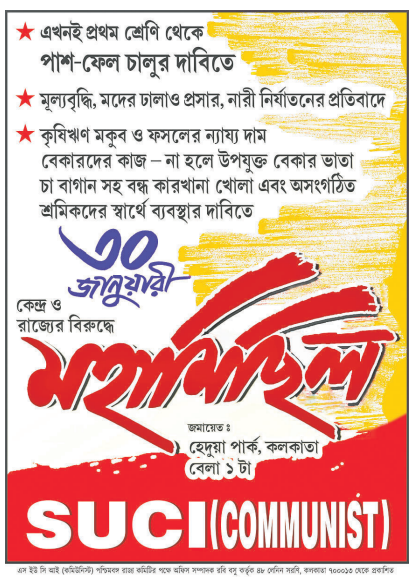

কমরেড ভি এন সিং স্মরণে সভা

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড ভি এন সিং ৪ ডিসেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

১৬ ডিসেম্বর সলতনত বাহাদুর ইন্টার কলেজ প্রাঙ্গণে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় জৌনপুর, প্রতাপগড়, সুলতানপুর, ইলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, মুরাদাবাদ, জেপি নগর, বালিয়া, গাজিপুর, চন্দৌলি, বারাণসী ইত্যাদি জেলা থেকে সহস্রাধিক দলীয় কর্মী, সমর্থক এবং সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন দলের প্রবীণ সদস্য কমরেড জগদীশচন্দ্র আস্থানা। সঞ্চালক ছিলেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড পুষ্পেন্দ্র।

শুরুতে প্রয়াত কমরেড ভি এন সিং-এর প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে মাল্যদান করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণকুমার সিং। পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধরের পক্ষে মাল্যদান করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন চ্যাটার্জি। এছাড়া অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র রাজ্য সভাপতি কমরেড হরিশঙ্কর মৌর্য, অল ইন্ডিয়া ডিওয়াইও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড মকরধ্বজ, অল ইন্ডিয়া এমএসএস-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড বন্দনা, কমসোমল-এর রাজ্য সহ-ইনচার্জ কমরেড মিথিলেশ মৌর্য, এআইকেকেএমএস-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড জগন্নাথ বর্মা, এআইইউটিইউসি-র পক্ষে কমরেড বিজয় পাল সিং প্রমুখ মাল্যদান করেন। সিপিআই(এম)-এর পক্ষে কমরেড জয়লাল সরোজ, সিপিআই-এর পক্ষে কমরেড রামপ্রতাপ তিওয়ারি সহ উপস্থিত সকলেই মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

এরপর এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী দার্শনিক এবং এসইউসিআই(সি) দলের প্রতিষ্ঠাতা সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষকে নিয়ে রচিত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সভার প্রধান বক্তা কমরেড অরুণকুমার সিং বলেন, ১৯৬৯ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষের সংস্পর্শে আসেন কমরেড ভি এন সিং। তার আগে তিনি সিপিআই করতেন, ট্রেড ইউনিয়ন করতেন এবং তারপর নকশাল গোষ্ঠীতেও গিয়েছিলেন। সে সময় একটা আন্দোলন চলাকালীন কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে তাঁর আলাপ আলোচনা হতে থাকে এবং তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, এসইউসিআই(সি) দলটিই ভারতের মাটিতে সত্যিকারের কমিউনিস্ট দল। সেই থেকে আজীবন তিনি উত্তরপ্রদেশে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

সভায় কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী বলেন, উনি ছিলেন সাহস, ধৈর্য এবং জ্ঞানচর্চার এক অমূল্য দৃষ্টান্ত। নিজের গোটা জীবনকে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও মিছিলে পুলিশের লাঠি সহ্য করেছেন। মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম দরদবোধ।

সভাপতি কমরেড জগদীশচন্দ্র আস্থানা বলেন, কমরেড ভি এন সিং ছিলেন উত্তরপ্রদেশে পার্টি গড়ে তোলার কঠিন সংগ্রামের একেবারে প্রথম দিকের সহযোদ্ধা। তাঁর প্রয়াণে পার্টি এবং গণআন্দোলনের বিরাট ক্ষতি হল। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার আলোকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আমাদের সেই ক্ষতি পূরণ করে গণআন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমরেডস জগন্নাথ বর্মা, বেচন আলি, বিজয় পাল সিং, রবিশঙ্কর মৌর্য, রাজবেন্দ্র সিং, জয়প্রকাশ মৌর্য, শীল কুমার, শৈলেন্দ্র কুমার, ধর্মদেব প্রমুখ। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের পর সভা সমাপ্ত হয়।

জীবনাবসান

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড রেশমা খাতুন ১৯ ডিসেম্বর এম জে এন হাসপাতালে মাত্র ২৬ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কোচবিহার ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি বিপ্লবী ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করে ছাত্রীসংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন তিনি। সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করেও নিষ্ঠার সাথে সংগঠনের কাজকর্ম করছিলেন তিনি। তাঁর এই অকালমৃত্যুতে দল একজন সম্ভাবনাময় কর্মীকে হারাল।

কমরেড রেশমা খাতুন লাল সেলাম

লরি ট্রান্সপোর্ট কর্মচারী ইউনিয়নের সভা

৮-৯ জানুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে ৫ জানুয়ারি কলকাতার বড়বাজার সংলগ্ন তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিটের মোড়ে সভা করল এআইইউটিইউসি অনুমোদিত লরি ট্রান্সপোর্ট কর্মচারী ইউনিয়ন। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সভাপতি সাহাব আলম ও সম্পাদক জ্যোতির্ময় বসু। বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষ ও এসইউসিআই(সি)-র কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড আয়সানুল হক।

পাশ-ফেল চালু সহ শিক্ষার নানা দাবিতে ত্রিপুরায় ছাত্র বিক্ষোভ

পাশ-ফেল চালু সহ নানা দাবিতে ২ জানুয়ারি ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির উদ্যোগে শিক্ষা ভবনের সামনে ছাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। চার জনের এক প্রতিনিধি দল ত্রিপুরা সরকারের মানবসম্পদ বিকাশমন্ত্রী, রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তার নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন।

তাঁরা দাবি করেন, প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল প্রথা চালু করতে হবে, বিদ্যালয়ের সংখ্যা না কমিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক সিলেবাস চালু করতে হবে এবং বিদ্যালয় স্তরে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ চালু করতে হবে। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড মৃদুলকান্তি সরকার, রাজ্য সম্পাদক কমরেড রামপ্রসাদ আচার্য, কমরেডস আশিস সরকার, রাজু আচার্য প্রমুখ।

মুখ্যমন্ত্রী একটু ব্যাখ্যা করে বলুন

একের পাতার পর

কি সত্যিই হওয়া যায়? নাকি গরিব কৃষকের অসহায়তার সুযোগে তাদের কিছু পাইয়ে দেওয়ার ঘোষণা করে ভোটের বাজার চাঙ্গা করাই এই ঘোষণার একমাত্র উদ্দেশ্য!

মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, তাঁদের রাজত্বে কৃষকদের আয় নাকি তিনগুণ বেড়ে গেছে। একেবারে তিনগুণ! এ তো বাংলায় একেবারে স্বর্গ নামিয়ে আনা! অবশ্য হবে না-ই বা কেন, কেন্দ্র সরকার যদি ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করে দেব বলে ঘোষণা করে তবে তাকে টেক্কা দিতে তিন গুণের কমে আর ঘোষণা করা যায় কী করে! কিন্তু এই যেখানে চাষিদের দুরবস্থা সেখানে কোন জাদুমন্ত্রে মুখ্যমন্ত্রী বাংলার কৃষকদের আয় তিন গুণ করে দিলেন? আর তাই যদি করে দিলেন তবে কৃষকরা অনাহারে কিংবা আত্মহত্যায় মরছে কেন? কেন মৃত্যুর জন্য ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করে কৃষক দরদি সাজার মরিয়া চেষ্টা করতে হচ্ছে সরকারকে? দেখা যাক, সরকারি এই দাবির বাস্তব ভিত্তি কতখানি।

ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের দেওয়া তথ্য অনুসারে, ২০০২-০৩ থেকে ২০১২-১৩ এই সময়ে কৃষিতে বৃদ্ধির হার যেখানে হরিয়ানায় ৮.৩ শতাংশ, ওড়িশায় ৭.৬ শতাংশ, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে তা -১.৩ শতাংশ। সারা দেশে বৃদ্ধির হারে সবচেয়ে নিচে। ২০১৩-র জানুয়ারি-ডিসেম্বর রিপোর্ট অনুসারে ভারতে কৃষক পরিবারের ৫৩.৩৭ শতাংশ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সেই সংখ্যা ৫৬.৯৪ শতাংশ, যা সর্বভারতীয় গড় পরিসংখ্যানের চেয়ে ৩.৫ শতাংশ বেশি। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এ রাজ্যে কৃষি থেকে আয় ক্রমাগত নেমে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করতে পারেন, তাঁদের আগে যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন তাঁদের অপদার্থতাতেই রাজ্যের এই দুরবস্থা। তাঁরা এসে কৃষির খোলনলচে এমন বদলে দিয়েছেন যার ফলে এমন অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু কীভাবে তাঁরা তা করলেন তার কোনও হদিশ রাজ্যের মানুষ জানে না। রাজ্য সরকারের ব্যুরো অফ অ্যাপ্লায়েড ইকনমিকস অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকসের 'স্টেট স্ট্যাটিস্টিক্যাল হ্যান্ডবুক ২০১৫'-র তথ্য অনুসারে ২০১১ থেকে ২০১৫-তে ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হার বেড়েছে ৩৪.০৯ শতাংশ। সেই সময়ে কৃষিক্ষেত্রে আয় বেড়েছে ৫৯.২৯ শতাংশ। অর্থাৎ কৃষকের যথার্থ আয়বৃদ্ধির পরিমাণ ২৫.২০ শতাংশ। তা হলে কৃষকের বার্ষিক আয় বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৬.৩ শতাংশ হারে। যাকে মুদ্রাস্ফীতির নিরিখে বিচার করলে আয়বৃদ্ধিই বলা যায় না। ২০১৭ ও ২০১৮ এই দু'বছরেই পশ্চিমবাংলায় বন্যার প্রকোপে চাষের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছিল ২০১৭-র বন্যায় ৮০ শতাংশ কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং ২০১৮-র বন্যার ক্ষতিপূরণ হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের থেকে ৩০ হাজার কোটি টাকা চেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও এই সময়ে কী এমন মিরাকল ঘটল যে চাষির আয় তিনগুণ হয়ে গেল তা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মানুষকে জানাননি।

আসলে এ সব অবাস্তব কথা বলে, সরকার কৃষকদের কত ভাল রেখেছে তারই প্রচার করা হয়, মিথ্যার জাল বুনে কৃষকদের ধোঁকা দেওয়া হয়। 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পটি তেমনই একটি প্রকল্প। মৃত কৃষকের পরিবারকে ২ লাখ টাকা পেতে হলে প্রথমে মৃত ব্যক্তি যে কৃষক তা প্রমাণ করতে হবে। আর এই প্রমাণ তখনই সম্ভব হবে যখন তৃণমূলের নেতামন্ত্রীরা তাকে কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি দেবেন। তাঁদের স্বীকৃতির অভাবেই তো রাজ্যে একের পর এক কৃষক মৃত্যুর পরও তাঁরা সগর্বে ঘোষণা করেন রাজ্যে ঋণের দায়ে কিংবা ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে কোনও কৃষকের মৃত্যু ঘটেনি। ফলে আগামী দিনেও যত কৃষকের মৃত্যুই ঘটুক কোনও পরিবার এই টাকা পাবে কি না তাতে গুরুতর সন্দেহ রয়েছে। একই ভাবে প্রতি একর খারিফ এবং রবি চাষের জন্য দু-কিস্তিতে ৫ হাজার টাকা প্রতি কৃষককে দেওয়ার যে ঘোষণা সরকার করেছে তা-ও কতজন কৃষক পাবে বা আদৌ পাবে কি না, তা কেউ জানে না। পেলেও তৃণমূল নেতাদের কমিশন কেটে কৃষকের হাতে কত থাকবে তা একমাত্র সংশ্লিষ্ট তৃণমূল নেতাদের মর্জির উপরই নির্ভর করছে।

ভোটের নামে কৃষকদের নিয়ে এই খেলা কেন্দ্র এবং রাজ্য দুই সরকারই খেলে চলেছে। কৃষকরা সেই দুরবস্থার মধ্যেই পড়ে রয়েছে। এ অন্যায়-মিথ্যাচার-প্রতারণার অবসান নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পাল্টে পাল্টে এতদিন হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। এর জন্য চাই কৃষক-শ্রমিক তথা গরিব খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন— যে আন্দোলন একদিকে কৃষকদের দাবিগুলি আদায় করবে, অন্য দিকে শোষণমূলক, ভোটকেন্দ্রিক এই ব্যবস্থাকে পাল্টে সত্যিকারের জনগণের রাজ কায়েম করবে।

পাশ-ফেল ফেরানোর কথা বললেই স্কুলছুটের ধুয়া ওঠে কেন?

পাশ-ফেল চালুর দাবি জোরালো হলেই শাসক শিবির আওয়াজ তোলে, স্কুলছুট ছাত্রের সংখ্যা বাড়বে। সত্যিই কি তাই?

স্কুলছুটের জন্য দায়ী প্রাথমিকে ইংরেজি এবং পাশ-ফেল— এমন অদ্ভুত তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে পূর্বতন সিপিএম সরকার। কীসের ভিত্তিতে সিপিএম এই তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিল? তারা কি কোনও সমীক্ষা করেছিল? স্কুল ধরে ধরে শিক্ষকদের মতামত নিয়েছিল? প্রকাশ্য বিতর্কের অবতারণা করেছিল? বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক-অধ্যাপক-শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিকদের অভিমত নিয়েছিল? না, কিছুই করেনি। একতরফা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা পাশ-ফেল তুলে দিয়েছিল। আর তার পক্ষে গলাবাজি করে গিয়েছিলেন সরকারি প্রসাদভোগী মুষ্টিমেয় কিছু ঘোলাটে বুদ্ধিজীবী। এমনকী চাটুকারবৃত্তি করতে গিয়ে তাঁরা সরকারি নীতির বিরোধিতায় রাস্তায় নামার অপরাধে সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিকদের প্রকাশ্যে গালাগালি দিতেও পিছপা হননি। রাজনৈতিক দল হিসাবে একমাত্র এস ইউ সি আই (সি) সেদিন সরকারি নীতির প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে গণআন্দোলন গড়ে তুলেছিল। যার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্তরের সাধারণ মানুষ। কিন্তু তার থেকে কোনও শিক্ষাই সিপিএম সরকার নেয়নি। এমনকী ১৯৯৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি ইংরেজি ও পাশ-ফেল চালুর ইস্যুতে সর্বাত্মক বাংলা বনধ হলেও সিপিএম সরকার জনমতকে উপেক্ষা করেছে। পরে ইংরেজি চালু করতে বাধ্য হলেও পাশ-ফেল চালু করেনি।

বিরোধী দল হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেস সেদিন ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার বিরোধিতা না করলেও, জনমত লক্ষ করে সরকারে এলে পাশ-ফেল ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতায় এসেই তৃণমূল প্রতিশ্রুতির পুরো উল্টো দিকে গিয়ে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের আনা 'শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯' মেনে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেয়। বিজেপি শাসিত রাজ্য সহ অন্যান্য রাজ্যগুলিও তুলে দেয়। এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে যতবারই পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে পাশ-ফেল চালুর দাবি নিয়ে সাক্ষাৎ করা হয়েছে, তিনি বলেছেন, পাশ-ফেল তাঁরাও চান। উল্লেখ করেছেন, এ ক্ষেত্রে বাধা শুধু কেন্দ্রীয় আইনের। ইতিমধ্যে একদিকে আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি, অন্যদিকে শিক্ষার মানের মারাত্মক অবনমন, নানা সমীক্ষা রিপোর্ট, বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশ ইত্যাদির ফলে কেন্দ্রীয় সরকারও পাশ-ফেল চালুর কথা বলতে বাধ্য হয়। কেন্দ্রীয় সরকারই বলে ২৫টি রাজ্য পাশ-ফেল চালুর পক্ষে। অনেক টালবাহানার পর অবশেষে লোকসভা এবং রাজ্যসভাতেও শিক্ষার অধিকার আইনের সংশ্লিষ্ট সংশোধনী পাশ হয়েছে। ঘোষিত হয়েছে, রাজ্য চাইলে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল ফেরাতে পারে। আন্দোলন যখন এইভাবে কয়েক ধাপ সাফল্য অর্জন করেছে, ঠিক তখনই সংবাদ মাধ্যমে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী বলেন, স্কুলছুটের প্রশ্নটি নাকি তাঁকে ভীষণ ভাবাচ্ছে। কিন্তু পাশ-ফেল তুলে দিয়ে কি স্কুলছুটের রাস্তা বন্ধ হয়েছে? না কি তার জমিই উর্বর হয়েছে?

শিক্ষামন্ত্রী কি এমন কোনও সমীক্ষার কথা বলতে পারবেন, যেখানে বলা হয়েছে পাশ-ফেল না থাকায় স্কুল-ছুট কমেছে? বরং ঠিক এর বিপরীত কথাটাই সত্য। দেখা যাচ্ছে ২০০৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল ২৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৯ জন। তাদের মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার কথা ২০১৮ তে। সে বছর মাধ্যমিক দিয়েছে ১১ লক্ষ ২ হাজার ৯২১ জন (কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত)। এই বছরগুলিতে তো পাশ-ফেল ছিল না। বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কহীন কিছু ঘোলাটে বুদ্ধিজীবী যেমন চাইছেন সেই 'আনন্দঘন, চাপমুক্ত পরিবেশ'ই তো একেবারে সশরীরে বিরাজ করেছে! তাহলে প্রায় ১৩ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক পর্যন্ত পৌঁছাল না কেন? কোথায় গেল তারা? তাদের পাওয়া যাবে হোটেলের বাসন ধোওয়ার জায়গায়, ইটভাটায়, বাজি কারখানায়। মিড-ডে মিলে হয়ত কিছুদিন এক বেলা পেট ভরেছে। কিন্তু তাদের ঘরের হাঁ করে গিলতে আসা অভাবের রাহু যে আরও শক্তিশালী তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। এই পরিস্থিতি পাল্টাতে সরকার কী করেছে?

২০০৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল ২৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৯ জন। তাদের মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার কথা ২০১৮ তে। সে বছর মাধ্যমিক দিয়েছে ১১ লক্ষ ২ হাজার ৯২১ জন। এই বছরগুলিতে তো পাশ-ফেল ছিল না। ... তাহলে প্রায় ১৩ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক পর্যন্ত পৌঁছাল না কেন?

অন্যদিকে শিক্ষার মানের হাল কেমন দাঁড়িয়েছে? সিপিএম সরকারের আমলের অশোক মিত্র কমিশন থেকে শুরু করে সম্প্রতি প্রতীচী ট্রাস্টের সমীক্ষা এমনকী সরকারি সমীক্ষা পর্যন্ত দেখিয়েছে পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার পর থেকে শিক্ষার মানের ক্রমাগত অবনমন ঘটেছে। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা দ্বিতীয় শ্রেণির পড়াও বুঝছে না। তার উপর পড়ানোর জন্য দরকার পর্যাপ্ত শিক্ষক। তা কি সরকার দিয়েছে? সারা দেশেই বিপুল সংখ্যক শিক্ষকপদ শূন্য। সম্প্রতি মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের এক তথ্য থেকে জানা যায়, প্রাথমিকে (এলিমেন্টারি স্কুল) শিক্ষকের শূন্যপদের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে ৮৭,৭৮১, ছত্তিশগড়ে ৪৮,৫০৬, বিহারে ২,০৩,৯৩৪, উত্তরপ্রদেশে ২,২৪,৩২৯। তথ্য আরও বলছে উচ্চ-প্রাথমিকে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের ভীষণ অভাব। মহারাষ্ট্রে ৭৭ শতাংশ স্কুলে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নেই। এই সংখ্যা উত্তরপ্রদেশে ৪৬ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ৪০ শতাংশ, বিহারে ৩৭ শতাংশ। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক না থাকার অর্থ হল, হয় অঙ্কের শিক্ষক নিচ্ছেন ইংরেজি ক্লাস, বা বাংলার শিক্ষক নিচ্ছেন বিজ্ঞানের ক্লাস অথবা ক্লাস হচ্ছেই না। সারা দেশে এক লক্ষেরও বেশি স্কুল চলছে মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে। শিক্ষক ঘাটতি রয়েছে মাধ্যমিক স্তরেও। শুধু তাই নয়, কেরানির কাজে, মিড-ডে মিলের কাজে, ভোটার লিস্ট তৈরির কাজে, সরকারি নানা কর্মসূচিতে শিক্ষকদের ব্যস্ত রাখা হচ্ছে। পড়াবে কে? ফলে দরিদ্র ঘরের সন্তানরা দিনের পর দিন কিছুই না বুঝে ক্লাসে বসে থাকতে থাকতে শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ হারিয়েছে। বেড়েছে স্কুলছুট। এই সব দূর না করে পাশ-ফেলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে রেহাই মিলবে?

যারা দারিদ্রের কারণে বেসরকারি স্কুল বা প্রাইভেট টিউশনের সুযোগ— কোনওটাই নিতে পারছেন না, স্বাভাবিকভাবেই ড্রপআউটের অভিঘাত এইসব পরিবারেই বেশি। ফলে একটু সঙ্গতি থাকলেই অভিভাবকরা সরকারি স্কুলকে টা-টা করে সন্তানদের নিয়ে বেসরকারি স্কুলমুখো হচ্ছেন। কলকাতা সহ শহরাঞ্চলে সরকারি বহু স্কুল উঠেই যেতে বসেছে। বাড়ছে প্রাইভেট টিউশন নির্ভরতা। স্কুল শিক্ষাকে পঙ্গু করার সরকারের এই পদক্ষেপের পরিণামে স্কুল স্তর থেকেই শিক্ষার বেসরকারিকরণ-ব্যবসায়ীকরণের রমরমা বেড়েছে।

রাজ্য সরকার শিক্ষার অধিকার আইনের অজুহাত দিয়ে পাশ-ফেল চালু নিয়ে টালবাহানা করছে। অথচ সেই আইনেরই ৩০ জন ছাত্র প্রতি এক জন শিক্ষক নিয়োগের নিয়ম আজও কেন্দ্র-রাজ্য কোনও সরকারই কার্যকরী করল না। এক্ষেত্রে আইন না মানার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তাদের শাস্তিও হল না। তাহলে পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার আসল উদ্দেশ্য যে শিক্ষার বেসরকারিকরণের রাজপথ খুলে দেওয়া তা বুঝতে অসুবিধা হয় কি? শিক্ষাকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালু করার দাবিতে এস ইউ সি আই (সি) বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। ৩০ জানুয়ারি কলকাতায় মহামিছিল। শুরু হবে হেদুয়া পার্ক থেকে, বেলা ১টায়।

মধ্যপ্রদেশে কৃষকদের বিক্ষোভ

চাষিদের দুর্দিন চলছেই। মধ্যপ্রদেশের মণিখেড়া গ্রামে আত্মঘাতী হয়েছেন আরও এক দুঃস্থ চাষি। প্রতিবাদে ৪ জানুয়ারি এ আই কে কে এম এস-এর গুনা ইউনিটের পক্ষ থেকে জয়স্তম্ভের চৌমাথায়

বিক্ষোভ দেখানো হয়। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড মনীশ শ্রীবাস্তব বিক্ষোভ সভায় বলেন, মধ্যপ্রদেশ সরকার চাষিদের সমস্যার সমাধানে কোনও আন্তরিকতার পরিচয় দিচ্ছে না। যে সামান্য ঋণ মকুবের কথা বলা হচ্ছে তা চাষির তেমন কোনও কাজেই লাগবে না। বাস্তবে পুরো ঋণ যদি মকুব করা হয়ও তা হলেও চাষি সমস্যার সমাধান হবে না। এটা জেনেও সরকার শুধু সস্তা ভোট-রাজনীতির দিকে তাকিয়ে বাজিমাত করার চেষ্টা করছে, ফসলের ন্যায্য দামের ব্যবস্থা না করতে পারলে আবারও চাষি ঋণ নিতে বাধ্য হবে এবং আবারও সর্বস্বান্ত হবে।

ঘাটশিলায় ছাত্র শিক্ষাশিবির

ঘাটশিলায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রে ৩০ ডিসেম্বর থেকে অনুষ্ঠিত হয় এ আই ডি এস ও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির তিন দিন ব্যাপী শিক্ষাশিবির। শিবিরে ৮০০ প্রতিনিধি কমরেড শিবদাস ঘোষ রচিত দু'টি বই নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। শিবির পরিচালনা করেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু (ইনসেটে ছবি)।

চ্যাংড়াবান্ধায় কৃষকদের বিক্ষোভ

কৃষকদের কাছ থেকে হাটে হাটে ন্যায্য মূল্যে ধান কেনা, চ্যাংড়াবান্ধা বাজার ও বাজার সংলগ্ন রাস্তাঘাট দ্রুত সংস্কার করা, ডাঙারহাট বাগডোগরা সংযোগকারী ডাকুরঘাট অচল ব্রিজ দ্রুত পাকা ব্রিজে পরিণত করা, বিহারের মতো পশ্চিমবঙ্গেও মদ নিষিদ্ধ করা, ওড়িশার মতো প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালু, দুর্নীতি ও দলবাজি বন্ধ করে বছরে ২০০ দিন কাজ ও দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরি দেওয়া প্রভৃতি দাবিতে কোচবিহার জেলার চ্যাংড়াবান্ধায় বিডিও-কে ডেপুটেশন দেয় এস ইউ সি আই (সি) মেখলিগঞ্জ লোকাল কমিটি। এরপর বিডিও অফিস থেকে চ্যাংড়াবান্ধা বাজার পর্যন্ত মিছিল করা হয়। মিছিলের শেষে বাজারে পথসভায় বক্তব্য রাখেন লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড রতন বর্মন। এছাড়া কমরেড জগদীশ অধিকারী, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রুহুল আমিন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

তুফানগঞ্জে মদ বন্ধের দাবিতে আন্দোলনে মহিলারা

মদ বন্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ করতে হবে— এই দাবিতে ৩ জানুয়ারি কোচবিহারের তুফানগঞ্জ থানায় ডেপুটেশন দেয় অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের তুফানগঞ্জ মহকুমা কমিটি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়। থানায় ডেপুটেশন দেওয়ার আগে একটি সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে। নেতৃত্ব দেন মহকুমা সম্পাদিকা রবিয়া সরকার এবং সভানেত্রী শোভা বল।

হোসিয়ারি শ্রমিক কনভেনশন

কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী আইন ও নীতি প্রত্যাহার, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, বেকারদের কাজ, সকলের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও পেনশন, ন্যূনতম ১৮ হাজার টাকা মজুরি, স্থায়ী কাজে ঠিকা প্রথা বন্ধ, ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবস, বেসরকারিকরণ বন্ধ, সমকাজে সমমজুরি ও বন্ধ কারখানা খোলা সহ ১২ দফা দাবিতে এ আই ইউ টি ইউ সি সহ ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে ৮-৯ জানুয়ারি সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দেউলিয়ায় হোসিয়ারি শ্রমিকদের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের উপদেষ্টা নারায়ণ চন্দ্র নায়ক। মূল বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সভাপতি মধুসূদন বেরা। এরপর শ্রমিকদের একটি মিছিল দেউলিয়া বাজার পরিক্রমা করে এবং পথসভা হয়।

এ আই ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে রক্তদান শিবির

২৩ ডিসেম্বর এ আই ডি ওয়াই ও-র বেহালা পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় বি জি প্রেস আশ্রম মাঠে। উদ্বোধন করেন সংগঠনের কলকাতা জেলা সভাপতি কমরেড সঙ্গীতা ভক্ত। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন জেলা সম্পাদক কমরেড সঞ্জয় বিশ্বাস।

শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের উদ্যোগে স্মরণ সভা

মঞ্চে যুগ্ম সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী ও সান্টু গুপ্ত এবং বিভাস চক্রবর্তী

কলকাতার ভারত সভা হলে ৬ জানুয়ারি শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের উদ্যোগে বাংলার শিল্প-সংস্কৃতি জগতের সদ্যপ্রয়াত ব্যক্তিত্ব প্রখ্যাত কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সঙ্গীতশিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন ও সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিতের স্মরণসভা আয়োজিত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী।

প্রয়াত সাহিত্যিক, পরিচালক, সঙ্গীতশিল্পী ও সাহিত্যিকের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন প্রাক্তন সাংসদ ও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ মণ্ডল। ১ মিনিট নীরবতা পালনের পর মৃণাল সেনের সিনেমা এবং দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্যকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম স্টাডিজের প্রখ্যাত অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় এবং চিত্র সমালোচক ও লেখক শিলাদিত্য সেন। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অরুণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত জীবন নিয়ে আলোচনা করেন সঙ্গীতশিল্পী ও সমালোচক স্বপন সোম।

কৃষিঋণ মকুবের দাবি কোচবিহারে

কৃষিঋণ মকুবের দাবিতে ৪ জানুয়ারি কোচবিহারের আলু-পাট-ধান চাষি সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে শহরে বিক্ষোভ মিছিল এবং জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

কমিটির সম্পাদক নৃপেন কার্যি বলেন, একাধিক রাজ্যে কৃষকদের ঋণ মকুব করা হয়েছে। এ রাজ্যেও আমরা দু'লক্ষ টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মকুবের দাবি জানাচ্ছি। কমিটির আরও দাবি, কৃষি ফসলের লাভজনক দাম দিতে হবে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করে ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র খুলে সরাসরি চাষিদের থেকে ফসল কিনতে হবে, সার বীজ কীটনাশক সেচ বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে কৃষকদের সরবরাহ করতে হবে, কৃষিবিমা প্রকল্পের সময়সীমা আরও এক মাস বাড়াতে হবে।

বর্ধমানে জেলাশাসক দপ্তরে শ্রমিকবিক্ষোভ

বর্ধমান এআইইউটিইউসি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ৩ জানুয়ারি জেলাশাসককে ডেপুটেশন দিয়ে দাবি জানানো হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী আইন ও নীতি প্রত্যাহার, বন্ধ কলকারখানা খোলা, সকল বেকারের কাজ, মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহার, সকলের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও পেনশনের ব্যবস্থা, ন্যূনতম মজুরি ১৮ হাজার টাকা ও স্থায়ী কাজে ঠিকা প্রথা বন্ধ, ৮ ঘণ্টা শ্রমদিবস, বিড়ি শ্রমিকদের আইডেন্টিটি কার্ড ও সরকার নির্ধারিত মজুরি ২৪৩.১০ টাকা দেওয়া, মোটরভ্যান চালকদের সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা ও সমস্ত চালককে 'টিন' নম্বর প্রদান, আশাকর্মীদের ফরম্যাট বাতিল করে স্থায়ী কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি, বর্ধমান রেলওয়ে ওভারব্রিজের হকারদের পুনর্বাসন, ২০১৪ হকার আইন মেনে এ রাজ্যে হকার স্বার্থে সংশোধন করা প্রভৃতি।

ধর্মঘটের দিন দেশজুড়ে মিছিল, অবরোধ

প্রথম পাতার পর

অংশের ছাত্র-যুব-মহিলারাও এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে এগিয়ে আসেন। এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা ধর্মঘটের প্রস্তুতি পর্বের প্রচারে এবং ধর্মঘট সফল করতে সারা দেশে সক্রিয়ভাবে রাস্তায় নামেন। এ আই ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করার জন্য সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন।

কলকাতায় ৮ জানুয়ারি এসপ্ল্যানেড থেকে মিছিলে নেতৃত্ব দেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। মিছিল হিন্দ সিনেমার মোড়ে পৌঁছালে বিনা প্ররোচনায় পুলিশ লাঠি চালায় ও ৩২ জনকে গ্রেপ্তার করে। এক কর্মীকে পুলিশ রাস্তায় ফেলে বেধড়ক লাঠিপেটা করে এবং বউবাজার থানায় নিয়ে গিয়েও তাঁর উপর অত্যাচার চালায়। ওই দিন কলকাতায় হাজরা, যাদবপুর, মৌলালি, উল্টোডাঙা মোড়ে ৯১ জন কর্মীকে মিছিল থেকে গ্রেপ্তার করে। মৌলালিতে মিছিল করার সময় সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অশোক দাসকে এবং আলিপুরদুয়ার থেকে কমরেড অভিজিৎ রায় সহ ৮ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ফালাকাটায় ১৩ জন কর্মী গ্রেপ্তার হন। ৯ জানুয়ারি জলপাইগুড়িতে ১২ জন কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতে এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্বে রেল ও রাস্তা অবরোধ, মিছিল সংগঠিত হয়। সারা রাজ্যে সংগঠনের দুই শতাধিক নেতা-কর্মী ও শ্রমিক গ্রেপ্তার হন।

৯ জানুয়ারি কলকাতায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল এসপ্ল্যানেড পৌঁছালে কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য নরেন্দ্র মোদির কুশপুত্তলিকায় অগ্নি সংযোগ করেন। ওই দিনও পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে অবরোধ, মিছিল, পিকেটিং হয়। সরকারি প্রশাসন, মালিকদের গুন্ডাবাহিনীর প্ররোচনা, হুমকি, আক্রমণ সত্ত্বেও ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করার জন্য কমরেড ভট্টাচার্য রাজ্যের জনগণকে অভিনন্দন জানান এবং এই ধর্মঘট থেকে শিক্ষা নিয়ে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

▲ কলকাতার ধর্মতলা থেকে ওয়েলিংটন অভিমুখে মিছিল

▲ কলকাতার হিন্দ সিনেমা মোড়

▲ কেরালা

▲ মুঙ্গের, বিহার

কটক, ওড়িশা ▲

পুদুচেরিতে রেল অবরোধ ▲

▲ ভিওয়ানি, হরিয়ানা

▲ কোচবিহার

▲ আহমেদাবাদ, গুজরাট

▲ উত্তরাখণ্ড

সিআইএ কবুল করছে স্ট্যালিনের রাশিয়া সম্পর্কে তাদের প্রচারগুলি ছিল মিথ্যা

'গুলাগ' শব্দটি সোভিয়েট রাশিয়া এবং সমাজতন্ত্র বিরোধী প্রচার, আলোচনা ও লেখাপত্রে বহুচর্চিত। রুশ ভাষায় 'গুলাগ' শব্দটির অর্থ বন্দিদের শ্রম শিবির। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ায় ক্ষমতাসীন কমিউনিস্টরা নাকি যোশেফ স্ট্যালিনের নেতৃত্বে তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের বন্দি করে এই শ্রম শিবিরে ভরে দিতেন। প্রতিদিন চলত অকথ্য নির্যাতন। যার রোমহর্ষক বিবরণ সারা বিশ্বের অধিকাংশ সংবাদমাধ্যম গত ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে নিরলসভাবে প্রচার করে আসছে। এমনকী নানা গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমেও বিশ্বাসযোগ্য সত্যের আকারে এই গুলাগের কল্পিত কাহিনি প্রচার করা হয়েছে। এ ধরনের লেখকদের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফে ঢালাও আর্থিক সাহায্য, রাজনৈতিক আশ্রয়, তাদের রচনার ব্যাপক প্রচার এমনকী তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিতও করা হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও তার মতাদর্শকে আক্রমণ করার বিশ্বব্যাপী এই পরিকল্পনায় প্রধানতম ভূমিকা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ-র। এ হেন সি আই এ-র অতীতের সেই সব কর্মকাণ্ডের ডকুমেন্টগুলি প্রকাশ করা হয়েছে সম্প্রতি। সেই সব নথিপত্রের প্রকাশিত তথ্য সকলকে চমকে দিয়ে বলছে যে এ পর্যন্ত গুলাগ নিয়ে যত প্রচার হয়েছে তা আসলে উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে, পৃথিবীর দেশে দেশে অন্তর্ঘাত, খুন, গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়া, সন্ত্রাসবাদী নানা গোষ্ঠীকে অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ করে বর্বর নরহত্যায় মদত দেওয়া, সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ, ষড়যন্ত্র, রাষ্ট্রপ্রধানদের হত্যা ইত্যাদি অসংখ্য অপকর্মে কুখ্যাত সি আই এ সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ বিষয়েও নাক গলানোর জন্য নানা ধরনের গোয়েন্দাগিরি এবং অপকর্ম চালিয়ে গিয়েছিল ধারাবাহিকভাবে। তাদের সেই গোপন কাজকর্ম এবং অনুসন্ধানের রিপোর্ট তারা মার্কিন প্রশাসনের কর্তা তথা রাষ্ট্রপ্রধানদের উদ্দেশ্যে পাঠাতেন।

সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে প্রচার করা হয়েছিল যে শুধু '৩০-এর দশকে কুড়ি লক্ষ লোককে জেলে ভরা হয়েছিল এবং তাদের বেশিরভাগই রাজনৈতিক বন্দি। আর প্রকাশিত ডকুমেন্ট অনুযায়ী সোভিয়েত শাসনে কারাগারগুলিতে '৫৪ সাল পর্যন্ত মোট বন্দির সংখ্যা ছিল ২৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ২২০ জন। একটি গোপন রিপোর্টে সি আই এ ওয়াশিংটনকে জানায় যে তথাকথিত এই গুলাগের ৯৫ শতাংশ কয়েদি হচ্ছে সত্যিকার ক্রিমিন্যাল। চুরি-ডাকাতি-খুন ইত্যাদির মতো অপরাধে তারা অপরাধী। তাদের কোনও রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড নেই।

সি আই এ-র রিপোর্টই বলছে, ১৯৫৩ সালে এই সব কয়েদির ৭০ শতাংশকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এই সব কয়েদীদের নিরপরাধ হিসাবে দেখান স্ট্যালিন পরবর্তী সংশোধনবাদী কর্তারা। কিন্তু মুক্তি দেওয়ার এক সপ্তাহ থেকে ৩ মাসের মধ্যেই এই সব অপরাধীদের অধিকাংশই আবার অপরাধ করে এবং সরকারের পুলিশ তাদের পুনরায় গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ কয়েদিদের রাজনৈতিক আক্রোশের বলি হিসেবে দেখানোর চেষ্টা মিথ্যে প্রমাণিত হয়ে যায়। যদিও সে খবর সে সময় রাশিয়া সহ বিশ্বের সংবাদমাধ্যম সম্পূর্ণ চেপে দেয়।

জেলখানায় অত্যাচার অনাহার ইত্যাদির সম্পর্কে প্রচারের কোনও শেষ ছিল না। অথচ সিআইএ-র প্রকাশিত ডকুমেন্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দিদের শ্রমদান ব্যবস্থাটি শ্রম ও মজুরির নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হত। কয়েদিরা বেশি কাজ করলে বেশি মজুরি পেত। সি আই এ জানাচ্ছে যে সব কয়েদি তাদের নির্ধারিত কাজের মাত্র পাঁচ শতাংশ বেশি করত তাদের একদিনের জেলখাটাকে দুই দিন হিসেবে গণ্য করা হত।

সি আই এ তাদের রিপোর্ট-এ খাবারের জন্য মাথা পিছু যে রেশন-এর উল্লেখ করেছে তা এমনকী তথাকথিত বনেদি পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য দেশের যে কোনও জেলের খাদ্য তালিকা থেকে অনেক উন্নত। সেই খাদ্য তালিকায় ছিল স্যুপ, ব্রেড, ভেজিটেবল এবং মাংস অথবা মাছ।

ইতালীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন ঐতিহাসিক মাইকেল প্যারেন্টি সোভিয়েত আর্কাইভ এবং সি আই এ-র তথ্য বিশ্লেষণ করে সন্দেহাতীতভাবে দেখিয়েছেন যে সোভিয়েত লেবার ক্যাম্প (শ্রম শিবির) কোনওভাবেই নাৎসিদের মতো ডেথ ক্যাম্প ছিল না। কোনও রকমের প্রণালীবদ্ধ গণনিধন ব্যবস্থা, গ্যাস চেম্বার ইত্যাদি যা নাৎসিরা গোটা ইউরোপে তৈরি করেছিল, এখানে সেরকম কোনও ব্যাপারই ছিল না। গুলাগের অধিকাংশ বাসিন্দাই তাদের মেয়াদ শেষের পর সশরীরে ছাড়া পেয়েছে। অথবা ক্ষমা প্রদর্শনের কারণে মেয়াদের আগেই মুক্তি পেয়েছে। সি আই এ-র রিপোর্টে আছে প্রতি বছরে এই ক্যাম্পগুলি থেকে ২০ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ কয়েদি মুক্তি পেত। বিস্ময়কর হল তাদেরই জানা সত্যের ঠিক বিপরীত কথা তারা তাদের বিশ্বময় নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে দীর্ঘদিন প্রচার করে গেছে এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে একটা দানবীয় সমাজ হিসাবে প্রচার চালিয়ে গেছে।

সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতদের গুলাগের মৃত্যুর যে সংখ্যা দেখিয়ে তাকে অনাহারে মৃত্যু বা হত্যা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে তা যে ইচ্ছাকৃত তথ্য বিকৃতি তা মাইকেল প্যারেন্টি (সোভিয়েত আর্কাইভ ও সি আই এ-র প্রকাশিত তথ্য থেকে) দেখিয়েছেন। ১৯৩৪-১৯৫৩ পর্যন্ত এই কুড়ি বছরে যত মৃত্যু গুলাগে হয়েছিল তার অর্ধেকেরও বেশি হয়েছিল ১৯৪১-১৯৪৫ — এই চার বছরে। ১৯৪৪ সালে গুলাগ ক্যাম্পে মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ৯২ জন। বাস্তব সত্য হচ্ছে, এই সময়কালে রাশিয়ার সাধারণ মানুষের মৃত্যুর হার ছিল এরও অনেক বেশি। এই সময় গোটা দেশে ২ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল যুদ্ধে কিংবা অনাহারে। এই সময় গুরুতর অপরাধে অপরাধীদের বাদ দিয়ে ইচ্ছুক কয়েদিদের অধিকাংশকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য।

রুশ সরকার যে জেলখানার পরিবেশ উন্নতিতে আন্তরিক ছিল তার প্রমাণ আছে এই দুই নথিতেই। যুদ্ধের সময় গুলাগের মৃত্যুর হার যেখানে ছিল প্রতি হাজারে ৯২ জন, ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই তা নেমে আসে মাত্র ৩-এ। এরকম অসংখ্য তথ্য সি আই এ তথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মিথ্যাচারী কুৎসিত চরিত্রকে এনে দিয়েছে দিনের আলোয়।

সম্মিলিত এই মিথ্যা প্রচারের চিত্রনাট্য প্রস্তুত হয়েছিল গত শতাব্দীর পাঁচের দশকের গোড়ার দিকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে কয়েক বছর আগে। ফ্যাসিস্ট হিটলারের নেতৃত্বাধীন সামরিক শক্তির চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার হাতে। জার্মানি সহ সারা ইউরোপে লক্ষ-কোটি মানুষের উপর চরম অবর্ণনীয় অত্যাচার আর বিশাল নিখুঁত পরিকল্পনায় সংগঠিত গণহত্যার, তথা আউসভিৎস, ব্রাভেন বুর্ক, মাথাউসেন ইত্যাদি অসংখ্য কুখ্যাত কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প-এর লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করার হাড় হিম করা ঘটনাবলির কথা তখন সারা বিশ্বের মানুষের কাছে উদঘাটিত। অন্য দিকে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী অন্যান্য সমস্ত দেশও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চরম সংকটে নিমজ্জিত। বস্তুত পক্ষে পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ অনিবার্য এই সংকটই জার্মানিকে ঠেলে দিয়েছিল ফ্যাসিবাদের দিকে। অন্যদিকে চরম ক্ষয়ক্ষতি, অসংখ্য জীবনহানি সহ প্রায় ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে রণক্লান্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সমাজতান্ত্রিক শক্তিতে গড়ে তুলছে সমস্ত দিক থেকে উন্নত সমৃদ্ধ এক নতুন দেশ। গোটা বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে উঠেছে এক স্বপ্নের বাস্তব। পূর্ব ইউরোপে, চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশের অভ্যন্তরে সমাজতন্ত্রের দাবি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে ক্রমশ। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের নতুন নেতা হিসেবে উঠে আসা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসররা খুব ভাল করে বুঝতে পারছিলেন সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণের এই ক্রমবর্ধমান উৎসাহের অর্থ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মৃত্যুর পদধ্বনি। তাই যেকোনও উপায়ে সমাজতন্ত্রের প্রতি মানুষের তীব্র আকর্ষণের এই বিশ্বব্যাপী প্রবণতাকে ঠেকাতে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরেও তাদের বন্ধু জুটিয়ে ফেলে। এরা ক্ষমতাচ্যুত পুঁজিপতি শ্রেণির প্রতিনিধি, যারা কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের নানা স্তরে আত্মগোপন করেছিল। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে দলের উনবিংশতিতম কংগ্রেসে এদের সম্পূর্ণ পরাজিত করার আহ্বান জানানোর পর অস্তিত্বের সংকটের আতঙ্ক এদের তাড়া করেছিল। মহান স্ট্যালিনের আকস্মিক মৃত্যু এদের সুযোগ করে দেয় সমস্ত কিছুকে ওলট পালট করে দেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে।

সভ্যতা ও মানবতাবিরোধী তাদের কীর্তিকলাপের নথিপত্র প্রকাশিত হওয়ার পর সিআইএ হয়ত তাদের পেশাদারিত্ব, বুদ্ধিমত্তা এবং দিনকে রাত করে দেওয়ার নিখুঁত পরিকল্পনার ছকে আত্মমুগ্ধ হবে। কিন্তু এই চরম মিথ্যার কোরাসে যারা গলা মিলিয়েছিলেন অন্তত একটু লজ্জা বা অনুশোচনা কি পাওয়া যাবে তাদের আচরণে?

তথ্য সূত্র ঃ

'দ্য ট্রুথ অ্যাবাউট দ্য সোভিয়েট গুলাগ সারপ্রাইজিংলি রিভিল্ড বাই দ্য সি আই এ'। (সাইদ তৈমূর অক্টোবর—০৭,২০১৮)

ওয়েবসাইট ঃ স্টারমিশকাটিইউশা, ডব্লিউআইএক্সআইটিই ডট কম

সি আই এ (ডকুমেন্ট ডিক্লাসিফায়েড। সোভিয়েট অর্কাইভাল ডকুমেন্ট)

প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেলের দাবি শিক্ষাবিদদের

অবিলম্বে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালুর দাবিতে সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির ডাকে ৭ জানুয়ারি কলকাতার থিওজফিক্যাল সোসাইটি হলে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল চ্যাটার্জী বলেন, আজ সমস্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলা হয়েছে, সরকার মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় শিক্ষার ভিত মজবুত করতে চায়, কারণ তাতেই ভবিষ্যতের লক্ষ্য নিশ্চিত হবে। অথচ প্রাথমিকের ছাত্ররা শিখল কি না তা দেখার জন্য পরীক্ষা নেওয়ার কাজটি করবে না। প্রথম শ্রেণি থেকে পরীক্ষা না নিলে কাজ হবে না। অথচ শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন সেটাও এ বছর থেকে সরকার চালু করতে পারবে না। অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার বলেন, কেবল কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার নয়, এদেশে আরও কিছু শক্তি আছে যারা প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু করার বিরুদ্ধে। ওই শক্তিদের বিরুদ্ধেও আমাদের লড়াই।

কনভেনশনে এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, অধ্যাপক পবিত্র গুপ্ত, সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক অনীশ রায়, সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক কার্তিক সাহা প্রমুখ। মূল প্রস্তাব পেশ করেন সুরজিৎ দেবরায়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জী।

করিমপুরে পাঠাগার উদ্বোধন

৩ জানুয়ারি নদীয়ার করিমপুর ২ নম্বর ব্লকের গোড়ভাঙা-ফলিয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হল বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী 'কাজী আলতাফ হোসেন স্মৃতি পাঠাগার'। উদ্বোধন করেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য জননেতা কমরেড শেখ খোদাবক্স। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক দীনেশচন্দ্র মণ্ডল। পাঠাগারে ছাত্রছাত্রীদের জন্য রেফারেন্স বই সহ সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শনের বইপত্র থাকবে। ইঞ্জিল শেখ ও মসিকুর রহমানকে যুগ্ম-সম্পাদক এবং শেখ খোদাবক্সকে সভাপতি নির্বাচিত করে ৫০ জনের একটি পাঠাগার পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়। এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পেরও আয়োজন করা হয়েছিল।

‘ভোট ডাকাতির’ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করুন

ভোটাধিকার, গণতন্ত্র ও মতপ্রকাশের অধিকার রক্ষায় আন্দোলন গড়ে তুলুন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র আহ্বান

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দর চৌধুরি ৪ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

গোটা প্রশাসন যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে গায়ের জোরে কার্যত একটি একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে আবারও ক্ষমতায় এল আওয়ামি লিগ। ১৯৭৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত দলীয় সরকারের অধীনে কোনও নির্বাচনই জনগণের গ্রহণযোগ্য হয়নি। কিন্তু এই নির্বাচন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে ‘ভোট ডাকাতি’র অনবদ্য কৌশলের জন্য। রাষ্ট্রের সকল সংস্থাকে প্রত্যক্ষভাবে রিগিংয়ের কাজে আর কোনও নির্বাচনে এভাবে নামানো হয়নি।

নির্বাচনের আগের দিন রাতে কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের মাধ্যমেই একটা বিরাট সংখ্যক ব্যালটে নৌকা মার্কায় ছাপ মারা হয়েছে। নির্বাচনের সময় ভোটারদের প্রকাশ্যে ভোট দিতে বাধ্য করা, মধ্যাহ্নভোজের বিরতির কথা বলে কিংবা নকল লাইন তৈরি করে বুথগুলিতে ভোট বন্ধ রেখে ছাপ মারা—এ রকম অভিযোগ অসংখ্য। নৌকায় ভোট না দেওয়ার অপরাধে নোয়াখালিতে চার সন্তানের জননীকে গণধর্ষণ করা হয়েছে। সংঘাতে এ পর্যন্ত ২০ জন মানুষ মারা গেছেন। ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামি লিগ পেয়েছে ২৫৬টি আসন, মহাজোট সব মিলিয়ে পেয়েছে ২৮৮টি আসন, বিএনপি-র ৫টি সহ ঐক্যফ্রন্ট বিজয়ী হয়েছে ৭টি আসনে। বিজয়ী হয়েছে না বলে বিজয়ী করা হয়েছে বলাই অধিক সঙ্গত, কারণ এই নির্বাচনের জয়-পরাজয়ে জনগণের ভোটের কোনও ভূমিকা ছিল না। নির্বাচনী নাটককে একটু কম হাস্যকর করার জন্য এই ৭টি আসন কোরবানি দিয়েছে আওয়ামি লিগ। দেশ ও বিদেশের দু’একটি সংবাদমাধ্যম ছাড়া গোটা মিডিয়ায় এই ব্যাপক ‘ডাকাতি’ চেপে যাওয়া হয়েছে। মানুষ জেনেছেন গুটিকয়েক মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সহায়তায় আর নিজেদের ও কাছের মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। গোটা দেশ মানতে না পারার ও অপমানের একটা তীব্র জ্বালার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। একটা থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে দেশ জুড়ে।

পুলিশ, সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড, সচিবালয় থেকে শুরু করে উপজেলা পর্যন্ত গোটা রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন সহ রাষ্ট্রের সমস্ত সংস্থা আওয়ামি লিগের পক্ষে কাজ করেছে। কাজ করেছে মিডিয়া। যারা একটু নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে চেয়েছে তাদের উপর আক্রমণ এসেছে। ঢাকার নবাবগঞ্জে যমুনা টিভি, দৈনিক যুগান্তর সহ বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ হয়েছে নির্বাচনের আগেই। আওয়ামি লিগ যাকে কিনতে পেরেছে তাকে কিনেছে, যে বিক্রি হয়নি তাকে ভয় দেখিয়েছে। যে তারপরও সমর্থন দেয়নি তাকে আক্রমণ করেছে। বিখ্যাত খেলোয়াড়, সিনেমার স্টার, অভিনয়শিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী, সাহিত্যিক— কে দাঁড়ায়নি আওয়ামি লিগের পিছনে! যেন নষ্ট হওয়ার উৎসব লেগে গেছে দেশে। এই নির্বাচনে ব্যয় হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা, যা তারা অর্জন করেছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও তহবিলের সীমাহীন লুটপাটের মধ্য দিয়ে।

ভারত সরকার কালবিলম্ব না করে আওয়ামি লিগকে অভিনন্দন জানিয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে শেখ হাসিনার জয়বাদ্য বেজেই চলেছে। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতার ফলেই আওয়ামি লিগের এই বিজয় সম্ভব হয়েছে। ভারতের নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল নির্বাচনকে গোল্ড সার্টিফিকেট দিয়েছেন। নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে সার্ক, ওআইসি, নেপালের পর্যবেক্ষক দল। বিদেশি পর্যবেক্ষকদের মধ্যে যাদের নিজেদের পক্ষে কথা বলানো যাবে বলে নিশ্চিত করা গেছে তাদেরই আসার অনুমতি দিয়েছে সরকার। বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষককে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছাড়পত্র ও ভিসা দেওয়া হয়নি। আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা ‘এনফ্রেল’ এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। কিন্তু সরকার কোনও কিছুরই তোয়াক্কা করেনি।

আওয়ামি লিগ কথায় কথায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলছে, কার্যত মুক্তিযুদ্ধকে সে ক্ষমতায় টিকে থাকার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। এ দেশের উন্মেষকালে লক্ষ কোটি মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার সেই চেতনার ধারেকাছেও এখন সে নেই। ‘এক দেশ এক অর্থনীতি’ বলে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আওয়ামি লিগ দাঁড়িয়েছিল, সেই ‘এক দেশ এক অর্থনীতি’ এখনও বিদ্যমান। গরিব আরও গরিব হচ্ছে, ধনী আরও ধনী হচ্ছে। ষাট-এর দশকে ভোটের অধিকারের জন্য আওয়ামি লিগ লড়েছে, অথচ আজ সে নিজেই জনগণের ভোটাধিকারকে নির্মমভাবে পদদলিত করছে। আজ জনগণকে সেই একই দাবি আবার তুলতে হচ্ছে, যে দাবিতে স্বাধীনতার পূর্বে লড়েছিল, জীবন দিয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আওয়ামি লিগ-বিএনপি-জাতীয় পার্টি-জামাত সহ ধনিক শ্রেণির সরকারগুলি ক্ষমতায় থাকার কারণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হয়নি সত্য, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে গদি দখলের কাজে বিক্রি ও ব্যবহার এ ভাবে আর কোনও দল করতে পারেনি।

ভোটের গণতন্ত্রের উপর যারা বিশ্বাস আজও রাখেন, যারা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুক্তি লাভ সম্ভব বলে মনে করেন— তাঁদের নিশ্চয় জানা আছে যে শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের দেশে দেশে আজ একই কাণ্ড ঘটছে। এক সময় বুর্জোয়া রাষ্ট্রে বিভিন্ন মতের দ্বন্দ্বকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের মত, আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে জনগণের কাছে যেত। জনগণ তাদের পছন্দমতো প্রার্থী বাছাই করত। সেই গণতন্ত্র আজ আর দুনিয়ায় নেই। আজ বুর্জোয়া দলগুলির কোনওটিই জনগণের ম্যান্ডেটের উপর নির্ভর করে না। তারা নির্ভর করে প্রশাসন, রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও সন্ত্রাসীদের উপর। ফলে আজ গোটা বিশ্বে মানুষের মত ধুলায় লুটাচ্ছে, গণতন্ত্র আজ নাম বদলে হয়েছে ‘নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র’, ‘উন্নয়নের গণতন্ত্র’। যারা মনে করেন বিএনপি, জামাত কিংবা ঐক্যফ্রন্ট এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারবে তাদের সে চিন্তাও ভুল। এরা ক্ষমতায় এলেও একই কাজ করবে। এরা একই শ্রেণির দল, এই ব্যবস্থায় এ ছাড়া তাদের টিকে থাকার কোনও উপায় নেই। একটু অতীতের দিকে তাকালেই দেখবেন, ২০০৮ সালে আওয়ামি লিগকে বিরাট ব্যবধানে জনগণ জিতিয়ে নিয়ে এসেছিল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকেই, অথচ আজ সে তার হাত থেকেই মুক্ত হওয়ার জন্য ছটফট করছে। ফলে আওয়ামি লিগ না হয় বিএনপি— এই করে করে জনগণ বারবার ঠকছেন। এই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন না ঘটিয়ে সরকার পরিবর্তনের সকল চেষ্টাই শেষপর্যন্ত ব্যর্থ চেষ্টা হবে।

নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য শেখ হাসিনাকে সেনাপ্রধান, নৌ বাহিনীর প্রধান, পুলিশ প্রধান, কোস্টগার্ড প্রধান, নির্বাচন কমিশনের সচিব সহ বিভিন্ন বাহিনীর প্রধান ও সংস্থার মুখপাত্ররা অভিনন্দিত করেছেন। এই সংস্থাগুলি সরকার নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় সংস্থা। রাষ্ট্র এবং সরকার এক নয়। সরকার মানে একটি দলীয় সরকার। একটি দলীয় সরকারকে রাষ্ট্রের কোনও সংস্থার প্রধানরা অভিনন্দন জানাতে পারেন না। অথচ তাঁরা তা করলেন। এ থেকে বোঝা যায় রাষ্ট্রের শক্তিকেন্দ্রগুলির মধ্যে যে ভারসাম্য সেটা ভেঙে গিয়ে কীভাবে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে। একটা পরিণত প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদ সৃষ্টি হয়েছে যা সমস্ত বিরোধী চিন্তাকে নির্মমভাবে দমনে প্রস্তুত।

এই অবস্থায় দেশের গণতন্ত্র ও প্রগতিমনস্ক, শিক্ষিত, সমস্ত নাগরিকবৃন্দ, কৃষক-শ্রমিক-পেশাজীবী, ছাত্র ও যুবসমাজ—সবার সামনেই এক কঠিন দায়িত্ব এসে পড়েছে। লাখো প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া এই দেশকে আমরা এ ভাবে শেষ হয়ে যেতে দিতে পারি না। বামগণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে নিয়ে আমরা এই ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে লড়ব। যত ব্যর্থতার ইতিহাসই থাকুক না কেন, এই অন্ধকারে তাদেরই দাঁড়াতে হবে। আমরা সবাইকে এই লড়াইয়ে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে ডারউইন তত্ত্বের উপর আবার আক্রমণ, প্রতিবাদে বিজ্ঞানীরা

এবার একজন ‘শিক্ষিত’ বিজ্ঞানী, অজৈব রসায়নের অধ্যাপক এবং একটি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মঞ্চে দাবি করলেন, ‘মহাভারতে কৌরবদের জন্ম স্টেম সেল থেকে এবং টেস্ট টিউব প্রযুক্তির মাধ্যমে’। তিনি আরও বলেছেন, ‘পৌরাণিক মহাকাব্য ইতিহাসই’।

এ হেন আরও অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার প্রাচীন ভারতে হয়েছে বলে বিজ্ঞান কংগ্রেসের শিশু-কিশোরদের অধিবেশনে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। কী নেই সেই ব্যাখ্যায়— ‘বিষ্ণুর দশাবতার তত্ত্ব ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের চেয়েও উন্নত’, ‘রামায়ণের যুগে রাবণের ২৪ রকমের বিমান ছিল’, ‘সেইসময় শ্রীলঙ্কায় বিমানবন্দর ছিল’, ‘হাজার বছর আগে আমাদের দেশে ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি ছিল’ ইত্যাদি।

এরই সাথে আরেক বিজ্ঞানী দাবি করেছেন, নিউটন, আইনস্টাইনের পদার্থবিদ্যা ছিল ভুল। আসলে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের নাম হবে নরেন্দ্র মোদি তরঙ্গ। আর মহাকর্ষজনিত আলোর বেঁকে যাওয়া— হর্ষবর্ধন ঘটনা।

প্রশ্ন হল, এইভাবে বিজ্ঞান কংগ্রেসের মতো মঞ্চকে বারবার দূষিত করা হচ্ছে কেন? নবজাগরণের ভাবধারায় বিজ্ঞানচর্চার তৎকালীন পীঠস্থান কলকাতায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বিজ্ঞান কংগ্রেসের পথ চলা শুরু হয়। এই বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন সেই যুগের মহান বিজ্ঞানীরা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৯২০), স্যার রামনাম চোপড়া (১৯৪৮) এবং অধ্যাপক পি পারিজা (১৯৬০) সহ অনেকেই প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চর্চার যথাযথ স্বীকৃতি দিয়েই আধুনিক ভারতে জোর দিয়েছেন যুক্তিনির্ভর, পরীক্ষা-প্রমাণ ভিত্তিক বিজ্ঞান চর্চায়।

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের শেষ পর্বে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সর্বাত্মক আক্রমণ নেমে আসছে বিভিন্নভাবে। ক্ষমতায় আসীন প্রায় সব দলই বিভিন্নভাবে শুধু এই প্রবাহকে ইন্ধন দিচ্ছে তাই নয়, সরাসরি ময়দানে নেমে পড়েছে শিক্ষাকে ধ্বংস করতে।

কেন্দ্রে আসীন বিজেপি সরকার এই প্রচেষ্টায় নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বনের রাস্তা নিয়েছে। সেই ২০১৪ সালে একটি বেসরকারি হাসপাতাল উদ্বোধন করতে এসে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, ‘গান্ধারীর শত পুত্র প্রসবের ঘটনা মহাভারতের যুগে স্টেম সেল ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং চর্চার উদাহরণ’। ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে বসে এইভাবে বিজ্ঞানকে আক্রমণের রাস্তা তিনিই শুরু করেন সুচারুভাবে। তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা তাঁর পথই অনুসরণ করে চলেছেন।

আশার কথা, বহু বিজ্ঞানী প্রতিবাদে নেমেছেন, রাস্তায় নেমে প্ল্যাকার্ড হাতে দাবি করছেন— এই অবস্থার পরিবর্তন চাই। আইএসসি বাঙ্গালোর, কোচি বিশ্ববিদ্যালয়, কিংবা রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ— সর্বত্রই আওয়াজ উঠছে— ‘অপবিজ্ঞানের প্রচার, প্রসার বন্ধ কর’।

বাঁকুড়া বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আন্দোলন

খরাপীড়িত বাঁকুড়া জেলায় কৃষি বিদ্যুতের নানা সমস্যা সমাধানের দাবিতে ১৩ ডিসেম্বর বিদ্যুতের জেলা প্রধানের দপ্তরে অ্যাবেকার নেতৃত্বে গ্রাহক বিক্ষোভ হয়। ২১ ডিসেম্বর বিষ্ণুপুরে বিদ্যুৎ দপ্তরে গ্রাহক বিক্ষোভ হয়। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল জেলার প্রধান আধিকারিককে ডেপুটেশন দেন। তিনি অন্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে অ্যাবেকার দাবিগুলি বিশেষত বিদ্যুতের লাইন কাটা বন্ধ, কাটা লাইন জুড়ে দেওয়া, বাঁশের খুঁটি পাল্টে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এ নিয়ে টালবাহানা হলে দ্রুত জানাতে বলেন। শেষে রাজ্য সম্পাদক উপস্থিত গ্রাহকদের কাছে অ্যাবেকার মূল দাবি— বিদ্যুতের দাম ৫০ শতাংশ কমানো, কৃষি বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার দাবি জানান। জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ, তারাপদ গড়াই, গোবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গ্রাহক আন্দোলনকে জোরদার করার আহ্বান জানান।

ভ্রম সংশোধন ঃ গণদাবীর ৭১-২০ সংখ্যায় মদ বন্ধের দাবিতে মহিলাদের আন্দোলন খবরে ভুলক্রমে আইজি-কে স্মারকলিপি দেওয়ার কথা ছাপা হয়েছে। স্মারকলিপি দেওয়া হয় হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং বিডিও-কে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

কেরালায় সিপিএম সরকারের পদক্ষেপে সাম্প্রদায়িক ও জাতপাতবাদী শক্তিগুলিই মদত পাচ্ছে

কেরালা রাজ্য এস ইউ সি আই (সি)

নবজাগরণের মূল্যবোধের পুনরুত্থানের নামে এবং শবরীমালা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকারের দাবিতে কেরালার শাসক সিপিএম কিছু জাতপাতবাদী সংগঠনের সাথে হাত মিলিয়ে যে 'উইমেন্স ওয়াল' বা 'মহিলা দেওয়াল' তৈরির কর্মসূচি নিয়েছে এবং তার জন্য সরকারি টাকা খরচ করে প্রচার চালাচ্ছে, সেই প্রসঙ্গে এসইউসি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেরালা রাজ্য সম্পাদক কমরেড ডাঃ ভি ভেনুগোপাল ১ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

'এর দ্বারা কেরালার নবজাগরণ আন্দোলনকেই কালিমালিপ্ত করা হবে। এর একমাত্র লক্ষ্য ভোটে সুবিধালাভ।

কেরালার নবজাগরণ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং মানবতাবাদী সংস্কৃতির ভিত্তিতে। কিন্তু সিপিএম সরকার পরিচালিত এই 'মহিলা দেওয়াল' আন্দোলনের বিরুদ্ধ মতবাদের প্রতি কোনও সহনশীলতাই নেই। যে সরকার বিরুদ্ধ মতবাদকে হত্যা করতে সংবাদমাধ্যমের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, তাদের নবজাগরণ সম্পর্কে বড় বড় কথা বলার কী অধিকার আছে? একসময় শুধুমাত্র উচ্চ ও নিম্নবর্ণের বিভেদের বিরুদ্ধে নয়, একই বর্ণের অভ্যন্তরীণ বিভেদ সহ নানা কু-অভ্যাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লক্ষ্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল কিছু সংগঠন। পরবর্তীকালে তারা সংশ্লিষ্ট জাতি-গোষ্ঠীর কায়েমি স্বার্থবাদীদের হাতে রাজনৈতিক দলগুলির উপর চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এবং ভোটব্যাঙ্ক তৈরির সংগঠনে অধঃপতিত হয়। ওই সব সংগঠন নবজাগরণ আন্দোলনের মহান নেতাদের তুলে ধরা মূল্যবোধ থেকে শুধু সরে এসেছে তাই নয়, তার বিরুদ্ধেই কাজ করছে। এই ধরনের সংগঠন, যাদের কোনও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নেই, লক্ষ্য কেবল শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে জাতপাতবাদী কতিপয় নেতার স্বার্থ চরিতার্থ করা— তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোন মূল্যবোধের জাগরণ ঘটবে?

'ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যা ঠিক তাই সঠিক, যা নয় তা ভুল'— এই মতবাদ সামন্ততন্ত্রের আদর্শগত ভিত্তি। বিপরীতে নবজাগরণ তুলে ধরেছে সবকিছুকে যুক্তির ভিত্তিতে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়ার জীবনদর্শন। কেরালায় নারায়ণগুরুর বিখ্যাত ঘোষণা ছিল, আমাদের কোনও ধর্ম বা জাত নেই। এর মধ্য দিয়ে কেরালায় নবজাগরণ আন্দোলনের শুরু। পরে এই আন্দোলনের অগ্রগতিতে চিন্তা আসে, 'মানুষের কোনও ধর্ম, জাত বা ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই।' শবরীমালা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকারের নামে কেরালার বর্তমান নয়া জাগরণবাদীরা যা করছে তাতে শক্তিশালী হবে সেই সব জিনিস, যা নবজাগরণ আন্দোলন একসময় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

সংঘ পরিবারের 'রাম মন্দির', 'গো-রক্ষার' মতো এই 'মহিলা দেওয়াল' আন্দোলনও একটা ভোটের চমক। কেরালা সরকারের এই অবিবেচনা প্রসূত পদক্ষেপ বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টির সুযোগ করে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে কেরালার জনগণকে এ জন্য অনেক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে হবে।

শবরীমালা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায় নিছক কানুনি দৃষ্টিতে সঠিক। কিন্তু, রাজনৈতিক আন্দোলন বিশেষ করে বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের পদক্ষেপ নিতে হয় সময়ের দাবিকে বিচার করে। বর্তমান সময়ের দাবি হল নবজাগরণ আন্দোলনের অসমাপ্ত কর্মসূচিগুলিকে সমাপ্ত করা। জাগতিক ঘটনাবলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা। দৈনন্দিন জীবনযাপনকেও ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত করার কাজে জনগণকে শিক্ষিত করা এবং অভ্যস্ত করে তোলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে হবে। কিন্তু সিপিএম নবজাগরণের নামে যা করছে, তা এ কাজে সাহায্য তো করবেই না, বরং অন্ধতা বাড়াবে। এর দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল জাতপাতবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিই লাভবান হবে। মহিলারা শবরীমালা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারলে নবজাগরণের কোন অপূরিত কাজটি সম্পূর্ণ হবে?

সাম্প্রদায়িকতাকে পরাস্ত করা এবং জনগণের ঐক্য রক্ষা করার একটিই রাস্তা— গণতান্ত্রিক আন্দোলন। জীবনের সমস্যাকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করার শিক্ষা দিতে পারে একমাত্র গণআন্দোলন। এ ছাড়া, অন্য কোনও সহজ রাস্তা নেই। পুঁজিবাদী শোষণে পিষ্ট জনগণকে ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসাবে টেনে আনতে হবে আন্দোলনের রাস্তায়। বাস্তব যে সমস্যাগুলি তাদের সকলের জীবনকে ছারখার করে দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে উন্নত নৈতিকতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এটাই নবজাগরণ আন্দোলনের সত্যিকারের ধারাবাহিকতা। সিপিএমের 'মহিলা দেওয়াল' আন্দোলন সেই পথ ধরেনি।

শবরীমালা

মালদায় মোটরভ্যান চালকদের সমাবেশ

মোটরভ্যান ধরপাকড় বন্ধ, চালকদের সরকারি লাইসেন্স ও পরিবহণ শ্রমিক হিসাবে প্রদান স্বীকৃতি সহ ৭ দফা দাবিতে সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের নেতৃত্বে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ ডি এম এবং এস পি-র নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

প্রায় সাত হাজার মোটরভ্যান চালকের বিশাল মিছিল মালদা টাউন হলের সামনে থেকে শহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিক্রমা করে ডি এম অফিসে পৌঁছায়। দীর্ঘ ২ ঘণ্টার মিছিলে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ও মালদা শহর অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রথমে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মোটরভ্যান ধরপাকড় বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিতে না চাওয়ায় চালকরা তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের অনমনীয় ও সংগ্রামী মেজাজের সামনে প্রশাসন পিছু হটে, থানায় আটকে রাখা মোটরভ্যান দ্রুত ছেড়ে দেওয়া এবং ধরপাকড় বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়। বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জয়ন্ত সাহা, জেলা সভাপতি অংশুধর মণ্ডল, গৌতম সরকার, মোটরভ্যান চালক আসামুদ্দিন সেখ, মনসুর আলি সহ আরও অনেকে। নেতৃবৃন্দ ৮-৯ জানুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানান।

শালবনি হাসপাতাল জিন্দালদের হাতে দেওয়ার প্রতিবাদ নাগরিকদের

জনগণের ট্যাক্সের টাকায় নির্মিত শালবনি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে ৫ জানুয়ারি হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের ডাকে মেদিনীপুর শহরের ফিল্ম সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত হয় গণকনভেনশন। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ এম সি লোহ। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র, অধ্যাপক জগবন্ধু অধিকারী, পূর্বতন প্রধান শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভূঞ্যা, শিক্ষক অতীন্দ্রনাথ বেরা, বিশিষ্ট নাগরিক দীপক বসু, নার্সেস ইউনিটির রাজ্য সম্পাদিকা পার্বতী পাল, শালবনী হাসপাতালের নার্স পাপিয়া টুডু।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, জিন্দালরা আরও ভাল পরিষেবা দেবে। পূর্বতন সিপিএম সরকার একই যুক্তিতে ঢাকুরিয়ার নিরাময় পলিক্লিনিক, যোধপুর পার্কের অরবিন্দ সেবাকেন্দ্র, যাদবপুরের কে এস রায় টিবি হাসপাতাল বেসরকারিকরণ করেছিল। বর্তমানে সেখানে আমরি, কেপিসি হাসপাতালের মতো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা চলছে। শালবনি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল বেসরকারিকরণের ক্ষেত্রে সরকার সফল হলে রাজ্যের আরও যে সব সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল জনগণের ট্যাক্সের টাকায় গড়ে উঠেছে সেগুলিরও বেসরকারিকরণ হবে, যেখানে বিনামূল্যে চিকিৎসার কোনও সুযোগ জনগণ পাবে না।

যে কোনও মূল্যে শালবনি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল বেসরকারিকরণের পরিকল্পনা প্রতিরোধ করার আহ্বান জানান বক্তারা। আন্দোলন তীব্রতর করতে শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভূঞ্যাকে সভাপতি এবং অধ্যাপক প্রভঞ্জন জানাকে সম্পাদক করে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি গঠিত হয়। ছয় শতাধিক মানুষ কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com